তৃতীয় অধ্যায়: বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা

৩.১ বৌদ্ধশিক্ষার সূচনা

৩.২ তক্ষশীলা

৩.৩ নালন্দা

৩.৪ বিক্রমশীলা

৩.৫ বলভী

৩.৬ সারনাথ

৩.৭ ওদন্তপুরী

৩.৮ জগদ্দল

৩.৯ অধ্যায় পরিশেষ

৩.১ বৌদ্ধশিক্ষার সূচনা

বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের উপর ভিত্তি করে যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তা ছিল সম্পূর্ণ মঠভিত্তিক। বুদ্ধ নির্দেশিত কতগুলি অনুশাসন অনুযায়ী বৌদ্ধ সঙ্ঘগুলি পরিচালিত হত। হিন্দু দর্শনের ন্যায় সঙ্ঘ জীবনের প্রবেশের বা দীক্ষা গ্রহণের আনুষ্ঠানিক সূচনা একটা নির্দিষ্ট রীতি বা অনুষ্ঠান মেনে সম্পন্ন হত। এই দীক্ষা ছিল দুই রকমের – ১) প্রবজ্যা বা প্রারম্ভিক দীক্ষা, এবং ২) উপসম্পদা বা চূড়ান্ত দীক্ষা।

১) প্রবজ্যা – বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশের আনুষ্ঠানিক সূচনা হল প্রবজ্যা। এর আক্ষরিক অর্থ হল নির্গত হওয়া অর্থাৎ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করার জন্য গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েন। প্রথমে বৌদ্ধ নিজে 'এ হি ভিক্ষু' বলে তাদের দীক্ষা দিতেন। পরবর্তীকালে দীক্ষা সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন বদল করে দীক্ষা কার্যের দায়িত্ব তাঁর শিষ্যদের উপর অর্পণ করেন। মাতা-পিতার অনুমতি ব্যতিত কেউ দীক্ষা গ্রহণ করতে পারত না। দীক্ষাপ্রার্থীর নূন্যতম বয়স ১৫ বছর হওয়া প্রয়োজন ছিল। এমনিত সমস্ত বর্ণের লোকেরাই দীক্ষা গ্রহণ করতে পারত, কিন্তু সঙ্ঘে যাতে কোনও অনাচার প্রবেশ করতে না পারে, সেইজন্য রাজকর্মচারী, চোর, ডাকাত, মাতা-পিতা হত্যাকারী, সন্ন্যাসিনী, ধর্ষণকারী, নপুংসক প্রভৃতিরা প্রবজ্যা গ্রহণ করতে পারত না (Keay,F.E,1992)। এছাড়াও কুষ্ঠ, গণ্ড, চর্মরোগ, ক্ষয়রোগ, মৃগীরোগ – এই পাঁচ রোগে আক্রান্ত মানুষদের প্রবজ্যা গ্রহণের অধিকার ছিল না। তাছাড়াও বিকলাঙ্গের সঙ্ঘে প্রবেশের অধিকার ছিল না।

প্রবজ্যা প্রার্থীকে একজন উপাধ্যায়কে বেছে নিতে হত। তারপর গোঁফ-দাড়ি ও মস্তক মুণ্ডন করে হলুদ পোষাক পরতে হত। তারপর দশজন ভিক্ষু দ্বারা গঠিত একটি পরিষদে হাজির হতে হত। দশজন সর্বসম্মতি দিলে ত্রিস্মরণ মন্ত্র উচ্চারণের পর দীক্ষা সম্পন্ন হত। এরপর তাকে দশটি অনুশাসন পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হত। এইভাবে বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রাথমিক দীক্ষালাভের পর তাদের উপাধি দেওয়া হত। এইভাবে বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রাথমিক দীক্ষালাভের পর তাদের উপাধি হত 'শ্রমণ'।

২) উপসম্পদা – শ্রমণ হওয়ার পর দীর্ঘ ২০ বছরকাল তাকে কঠোর নিয়মকানুনের মধ্য দিয়ে সঙ্ঘ জীবন পালন করতে হত। তারপর একটা চূড়ান্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাকে 'উপসম্পদা' প্রদান করা হত। উপসম্পন্ন হওয়ার পর তার নতুন নামকরণ হত ভিক্ষু। এরপর থেকে সে সঙ্ঘের পূর্ণ সদস্য বলে পরিগণিত হত এবং সঙ্ঘ জীবনের প্রকৃত অনুশাসনগুলো পালন করতে হত (বাগচী প্রবোধ চন্দ্র, ১৩৫৯)।

বৌদ্ধ দর্শনে কর্ম তিনি প্রকার –

১) কায়িক কর্ম

২) বাচিক কর্ম

৩) মানসিক কর্ম

এই তিন প্রকার কর্মের যথাযথ প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় যার প্রাথমিক বিভাগগুলি ছিল নিম্নরূপ-

পাঠপদ্ধতি::

লিপির প্রচলন থাকলেও সঙ্ঘগুলিতে মূলত মৌখিক পদ্ধতিতে পাঠদান হত। ধর্মতত্ত্ব এবং অনুশাসনগুলি মুখে মুখে শেখানো হত। এদিক থেকে হিন্দু শিক্ষার সাথে এর মিল ছিল। আলোচনা, উপকথা, উদ্দেশ্যপূর্ণ ছোটো ছোটো গল্পের মাধ্যমে গৌতম বুদ্ধ নিজে শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন এবং সেই পদ্ধতি মোটামুটি অউসরণ করা হত। তর্কের দ্বারা কোন বিষয় চুলচেরা বিশ্লেষণ করা বুদ্ধদেব স্বয়ং অপছন্দ করতেন, কারণ, তাঁর মতে তর্কের দ্বারা ধর্মশিক্ষা লাভ করা সম্ভব নয় (Dutt Nalinaksha, 1960)। তবে বৌদ্ধ ধর্মের নীতিগুলোকে সত্য প্রমাণ করার জ্য বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তর্ক করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হত।

প্রতিটি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগতভাবে গুরুত্ব দেওয়া হত। প্রত্যেকের মানসিক উৎকর্ষ ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু ছিল। অর্থাৎ আধুনিক ব্যক্তিবৈষম্যের নীতি সঙ্ঘগুলিতে প্রচলিত ছিল।

পাঠ্যতালিকা::

বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রাথমিকভাবে পাঠতালিকা খুব বেশি দীর্ঘ ছিল না। বৌদ্ধ ধর্মনীতি ও ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা অর্থাৎ নিয়মিতভাবে ত্রিপিটক পড়ানো হত। ধর্মের গূঢ় ও সাধারণ তত্ত্বগুলো শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে জ্ঞানচর্চা সীমাবদ্ধ ছিল। তবে শিক্ষার বিভিন্ন মান ছিল। সেই মান অনুযায়ী ছাত্রদের গুণ, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিচার করে ধর্মের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হত। পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম ছিল। কিন্তু সংস্কৃত, যজ্ঞ, দৈব, জ্যোতিষ, জাদু ইত্যাদি বিষয়গুলি নিষিদ্ধ চিল।

পরবর্তীকালে মহাযান শাখার উদ্ভবের পর পাঠ্যতালিকার বহুল পরিবর্তন হয়। শিক্ষার মাধ্যম ছিল মাতৃভাষা। সেই সময় ভারতবর্ষে যেহেতু বিভিন্ন স্থানীয় ভাষা প্রচলিত ছিল, সেহেতু সংঘগুলিতে বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর ভিক্ষুদের সমাগম হত। কারণ গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং সংস্কৃত ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি হন নি।

বৌদ্ধ শিক্ষার সুবিশাল আঙ্গিককে বুঝতে প্রাচীন বৌদ্ধ শিক্ষকেন্দ্রগুলির প্রকৃতি অনুধাবন করা অতীব প্রয়োজন।

৩.২ তক্ষশীলা

উদ্ভব ও বিকাশ:

প্রাচীন তক্ষশীলার গৌরবময় ইতিহাস জানার মত উপাদান খুবই অপ্রতুল। *রামায়ণ-মহাভারত*-এ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে তক্ষশীলার উল্লেখ আছে। হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ, বৌদ্ধশাস্ত্র, জাতকের কাহিনি থেকে তক্ষশীলার ইতিহাস আমরা জানতে পারি। গ্রিকদের বিবরণীতে ও তক্ষশীলার খ্যাতির কথা উল্লেখ আছে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন বৌদ্ধগ্রন্থে ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে গান্ধার রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমান কাশ্মীর উপত্যকা ও সিন্ধু উপত্যকার অন্যান্য অঞ্চল নিয়ে গান্ধার রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এই গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল তক্ষশীলা। ভরত এই নগরী প্রতিষ্ঠা করে পুত্র তক্ষকের নামানুসারে এই নগরীর নামকরণ করেছিলেন বলে *রামায়ণ*-এ উল্লেখ রয়েছে। *মহাভারত*-এ বর্ণিত জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ এখানেই সংঘটিত হয়েছিল। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থানের জন্য তক্ষশীলাকে বারবার বৈদেশিক আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ

শতাব্দীতে তক্ষশীলা পারসিদের অধিকারে ছিল। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আলেকজাণ্ডার তক্ষশীলা জয় করেন। পরে এটি চন্দ্রগুপ্তের আমলে মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এরপর আবার গ্রিকরা তক্ষশীলার ওপর অধিকার কায়েম করে। শেষে হুন আক্রমণে তক্ষশীলার পতন ঘটে। বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডির কুড়ি মাইল পশ্চিমে সরাইবালা স্টেশনের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে প্রায় বারো বর্গমাইল স্থান জুড়ে প্রাচীন তক্ষশীলার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।

শিক্ষাকেন্দ্রের স্বরূপ:

সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার জন মার্শালের তত্ত্বাবধানে খননকার্য চালানো হয়েছিল। খননকার্য থেকে তিনটি নগরীর চিহ্ন পাওয়া যায়। তবে তক্ষশীলার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কোন স্তূপ বা বহুসংখ্যক ছাত্রের স্থানধারণের উপযোগী কোনও বড় অট্টালিকা পাওয়া যায়নি। তাই মনে হয় তক্ষশীলাতে কোনো কেন্দ্রীয় মহাবিদ্যালয় ছিল না। তক্ষশীলার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে সারা ভারত থেকে ছাত্ররা এখানে আসত। শিক্ষকরা ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দিতেন। তাঁরা নিজেরাই ছিলেন এক-একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কোন কোন শিক্ষকের অধীনে পাঁচশ ছাত্র পড়ত। একজন শিক্ষকের পক্ষে এতজন ছাত্রকে পড়ানো অসম্ভব ছিল। তাই অপেক্ষাকৃত শিক্ষায় অগ্রসর ছাত্রদের উপর নবাগ ছাত্রদের ভার দেওয়া হত (Singh, Bhanu Pratap, 1990)। এভাবে 'সর্দার পড়ো' প্রথার উদ্ভব হয়েছিল। তৎকালীন যুগের বহু প্রতিভাধর জ্ঞানী ব্যক্তিরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মগধের রাজা বিম্বিসারের চিকিৎসক ও বুদ্ধভক্ত জীবক, সংস্কৃত বৈয়াকরণ পানিনী, অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা কৌটিল্য, কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ প্রভৃতি। কখনও কখনও আবার কোন কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে কোন

বিশেষ শিক্ষাদান করা হত। কোথাও হত ব্রাহ্মণদের, কোথাও শুধু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের এবং কোথাও রাজপুত্রদের শিক্ষাদান হত।

চিত্র ৩.১ তক্ষশীলার ধ্বংসাবশেষ

তথ্যসূত্রঃ *http://historypak.com/wp-content/uploads/2014/03/taxila.jpg*

পরিচালনা:

তক্ষশীলার শিক্ষাকেন্দ্রের ভার অধ্যাপকদের হাতে ন্যস্ত ছিল। পরবর্তীকালের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মত তক্ষশীলার শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক ছিল না। ছাত্ররা আপন খরচেই পড়াশোনা করতেন। বিত্তবান শিক্ষার্থীরা শিক্ষাব্যয়ের জন্য এককালীন এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা অধ্যাপককে দিতেন। তবে অধ্যাপকগণ এই টাকা পারিশ্রমিক হিসাবে নিতেন না। তা শুধু ছাত্রদের থাকা-খাওয়া ও বেশবাস প্রভৃতির জন্য ব্যয় করা হত। যাঁদের এই অর্থ দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না তাঁরা গুরুর সেবা করে দক্ষিণা মেটাতেন। দিনের বেলায় তাঁরা গুরুর সংসারের যাবতীয় কাজ করতেন আর অবসর সময়ে গুরুর

কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করতেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর দক্ষিণা দেওয়ার চলও ছিল। দক্ষিণা হিসাবে গুরুকে স্বর্ণ বা গো-ধন দেওয়ার রীতি ছিল (Mukherjee Radha Kumud, 1947)।

দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদেরকে গ্রামের ধনীরা সাহায্য করতেন। আবার তাঁরা মাঝে মাঝে ছাত্র ও গুরুদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। উচ্চশিক্ষার জন্য রাজদরবার থেকে বৃত্তির ব্যবস্থাও ছিল। অনাবাসিক ছাত্রদের কথাও জানা যায়। তাঁরা পাঠ শেষে রাত্রিবেলা নিজ নিজ বাড়ি ফিরে যেতেন। বহু ছাত্র নগরে বাসা নিয়ে গুরুর কাছে পাঠ নিতেন। বিবাহিত ছাত্ররাও পৃথকভাবে বাসা নিয়ে থাকতেন।

রাত্রেও শিক্ষাদান চলত। অনাবাসিক ছাত্ররাও রাত্রে শিক্ষালাভ করতেন। রাজকুমার জুনা রাত্রে গুরুর কাছে পাঠ নিয়ে সেই রাতেই গৃহে ফিরে যেতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার:

তক্ষশীলাতে অধ্যয়ন করার জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্ররা আসতেন। বারাণসী, রাজগৃহ, উজ্জয়িনী, কোশল, মিথিলা প্রভৃতি স্থান থেকে ছাত্ররা তক্ষশীলাতে আসতেন উচ্চশিক্ষার জন্য। পাণিনি ও চাণক্যের বর্ণনা থেকে জানা যায় – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার ছিল। শুধু চণ্ডালদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার ছিল না। তক্ষশীলা ছিল উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য তক্ষশীলাতে আসতেন। তক্ষশীলাতে শিক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের বয়স ছিল ১৬ বছর এবং তাঁরা প্রায় ৮ বছর যাবৎ তক্ষশীলাতে শিক্ষালাভ করতেন।

গণতান্ত্রিক শিক্ষা:

ধনী-দরিদ্র-উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে সবার শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল। দরিদ্র ছাত্ররা সবাই উপযুক্ত সম্মান ও যত্ন পেতেন। অর্থের বিনিময়ে যাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করতেন, তাঁরা অতিরিক্ত কোন সুবিধা পেতেন না বা তাঁদের জন্য নিয়ম-শৃঙ্খলা শিথিল করা হত না। বিত্তজনের পুত্ররা নিজেদের ব্যয়ের জন্য কোন অর্থ রাখতে পারত না।

শিক্ষকমণ্ডলী:

তক্ষশীলার শিক্ষকেরা এক বা একাধিক শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। যাঁরা ব্যবহারিক শিক্ষাদান করতেন, তাঁরা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তবে তক্ষশীলার বিখ্যাত অধ্যাপকদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। কোন কৃতী অধ্যাপকেরও নাম জানা যায়নি।

এক একজন গুরু সাধারণভাবে ২০জন ছাত্র গ্রহণ করতেন। কোন কোন গুরুর অধীনে পাঁচশ-র অধিক ছাত্রও ছিল। অধ্যাপকদের গুরু, আচার্য, উপাধ্যায় ইত্যাদি নামে বিশেষিত করা হত। অর্থশাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী পণ্ডিতগণ শিষ্ট, দণ্ডনীতিক, বরতক ইত্যাদি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিলেন এবং তাঁরা ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, বিবিধ বৃত্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে অভিজ্ঞ ছিলেন। পানিনি আচার্যা, উপাধ্যায়া ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করায় মনে হয় সেযুগে নারীরাও শিক্ষকতা করতেন।

পাঠ্যসূচি:

তক্ষশীলার পাঠসূচি ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। পাঠ্যসূচিতে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ও ব্যবহারিক শিক্ষায় বিশেষ জোর দেওয়া হত। জাতকের কাহিই থেকে জানা যায়, তক্ষশীলাতে

তিনটি বেদ ও আঠারোটা কলাবিদ্যা শেখানো হত। বেদ ছাড়াও তর্কশাস্ত্র, ন্যায়দর্শন, সাংখ্য, যোগদর্শন, বৌদ্ধশাস্ত্রের 'বিনয়পিটক ও সূত্র' ইত্যাদি শেখানো হত। নানা স্মৃতিও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত ছিল *মিলিন্দ পঞ্চহো'* গ্রন্থে উল্লেখিত বিষয়গুলি যেমন – হস্তীসূত্র, মায়াবিদ্যা, সঞ্জীবনীবিদ্যা, শিকারবিদ্যা, প্রাণীসমূহের ক্রন্দন বিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক বিদ্যা, ইন্দ্রিয় সংযম বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি পাঠ্যসূচিতে ছিল। এছাড়া ব্যবসা বাণিজ্য, রাজনীতি, হিসাবশাস্ত্র, নৌ ও জাহাজ নির্মাণ, ভাস্কর্য, দারু শিল্প, কৃষি, চিত্রাঙ্কন, হস্তশিল্প ইত্যাদি শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। পানিনির বিবরণে মনে হয় অভিনয় শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল।

চিকিৎসা বিদ্যা, সমরবিদ্যা ও ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য বিশেষ সুবন্দোবস্ত ছিল। সমরবিদ্যা শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে এটি এত প্রসিদ্ধ ছিল যে, একই সময় একসাথে প্রায় ১০৩জন রাজপুত্র তক্ষশীলাতে সমবেত হয়েছিলেন। তক্ষশীলার চিকিৎসাবিদ্যার খ্যাতি ছিল বিপুল। জীবন তক্ষশীলা থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেছেন (Altekar A. S.,1965)।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্রম গ্রহণের স্বাধীনতা ছিল। বারাণসীর এক বালক তক্ষশীলাতে 'ভবিষ্যদ্বাণী' সম্পর্কিত বিদ্যা শিক্ষালাভ করে পরে শিকারীর বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। অপর এক ব্রাহ্মণ ইন্দ্রজালবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। আর এক ব্রাহ্মণ ছাত্র বিজ্ঞানশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

শিক্ষণ পদ্ধতি:

শুনে শুনে শেখার প্রবণতা ছিল তক্ষশীলার প্রথম যুগের বৈশিষ্ট্য। তবে উপলব্ধির উপর সেযুগে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। মৌখিক শিক্ষাদানের সঙ্গে আলোচনা ও বিতর্ক ছিল শিক্ষাদানের অপরিহার্য অঙ্গ। তাই শিক্ষার্থীরা বিষয়গুলো বুঝেই মুখস্থ করতেন।

খুব জোরে মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হত বিদ্যাচর্চা। ছাত্রা শয্যাত্যাগ করে প্রাত্যহিক কাজ সম্পন্ন করার পর নিত্যকার পাঠ আবৃত্তিসহকারে অনুশীলন করতেন। গুরু খুব কঠিন পাঠগুলো সুন্দর করে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতেন। নানা প্রমাণ থেকে জানা যায়, পরবর্তীকালে তক্ষশীলায় পুঁথি নকল করা, লিখন উপাদান ব্যবহার করা, পুঁথি পাঠ করা স্বাভাবিক রীতিতে পর্যবসিত হয়েছিল। অন্যদিকে ব্যবহারিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে হাতে-কলমে কর্ম সম্পাদন ও ভ্রমণ ছিল বিশেষ অঙ্গ। এর দ্বারা শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির বিকাশ ও বাস্তব কৌশল প্রয়োগ সম্ভব হত।

পরীক্ষা পদ্ধতি:

তক্ষশীলার শিক্ষাব্যবস্থায় লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার রীতি ছিল না। সহজ সরল মৌখিক পরীক্ষা করে ছাত্রদের জ্ঞানের পরিমাপ করা হত। এছাড়া বিতর্ক সভায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিচয় দিতে হত। শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক জ্ঞান কতটা আছে তা পরীক্ষা করার জন্য ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বিদ্যার্থী জীবককে নানা কূট প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি তক্ষশীলার আশেপাশের নানা বন্য গাছপালা পরীক্ষা করে তাদের ভেষজ গুণাগুণ আবিষ্কার করেছিলেন। বিদেশ ভ্রমণ শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ ছিল। ভ্রমণকালে শিক্ষা সমাপ্ত করা ছাত্ররা তাঁদের অধীত বিদ্যার প্রয়োগ করতেন এবং স্থানীয় আচরণ-ব্যবহার-রীতি-নীতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতেন।

শিক্ষাকেন্দ্রের খাদ্যপ্রণালী ও শৃঙ্খলা:

খাদ্য ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সরল। মধ্যাহ্নে গুরুপত্নীর নিজের হাতে তৈরি করা ভাতের মণ্ড ভক্ষণ করতে হত ছাত্রদেরকে। তবে নিমন্ত্রণের সময় ছাত্রদেরকে চিনি, গুড়, দধি, দুধ ইত্যাদি পরিবেশন করা হত।

সমস্ত ছাত্রদের বিশেষভাবে শৃঙ্খলা মেনে চলতে হত। প্রত্যেক ছাত্রকে জ্বালানির কাঠ আহরণ করতে বনে যেতে হত। তাঁদের একা থাকার স্বাধীনতা প্রায় ছিল না। স্নান করার সময়ও তাঁরা শিক্ষকের সঙ্গে নদীতে যেতেন।

শাস্তি প্রসঙ্গ:

অযোগ্য ছাত্রদের গুরু মৃদু ভর্ৎসনা করে ছেড়ে দিতেন। অমনোযোগী ও অযোগ্য ছাত্রদের নানা বিশেষণে অভিহিত করা হত। অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি সবার জন্য সমান ছিল। “Strict discipline was enforced and its breaches, regardless of rank, status of family, were severly punished, occasionally also with flogging with a bamboo cane on the back.”

ধ্বংস:

খ্রিস্টিয় শতক শুরু হওয়ার সময় থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি কমতে থাকে। তবে কুশান রাজত্বের শেষ অবধি (২৫০ খ্রি.) তক্ষশীলার খ্যাতি বর্তমান ছিল। সম্ভবত হুণ আক্রমণে তক্ষশীলা ধ্বংস হয়ে যায়। পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে ফা-হিয়েন যখন তক্ষশীলায় আসেন তখন সেখানে গৌরব করার মত কিছুই বিশেষ অবশিষ্ট ছিল না। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ তক্ষশীলাতে শুধু ধ্বংসস্তূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

প্রাচীন তক্ষশীলার শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। Hindusthan Review-তে (March, 1906) S.C. Das লিখেছেন – "The influence of the University extended to Persia in the West, to Bactria in the North and Prachya to the East."

৩.৩ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাচীন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে নালন্দা সবচেয়ে বেশি খ্যাতিলাভ করেছিল। নালন্দার সেই খ্যাতি শুধু দেশের মধ্যে নয়, দেশের সীমানা পেরিয়ে – এশিয়ার বিস্তৃত অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। পঠনপাঠন, বিখ্যাত অধ্যাপকগণের সমাবেশ, পরিচালন সক্ষমতার জোরে আক্ষরিক অর্থে নালন্দা সেই যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল।

ভৌগোলিক অবস্থান:

বর্তমান বিহারের রাজধানী পাটনা (প্রাচীন পাটলিপুত্র) থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিল প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগৃহ। রাজগৃহের ৭ মাইল উত্তরে বড়গাঁর কাছে ছিল প্রাচীন নালন্দার অবস্থান।

প্রতিষ্ঠা ও নামকরণ:

তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথের মতে নাগার্জুন নালন্দা শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেন (আনুমানিক ৩০০ খ্রি.)। আনুমানিক ৩২০ খ্রিস্টাব্দে নাগার্জুনের শিষ্য আর্যদেব সম্ভবত নালন্দাতে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। যদিও ফা-হিয়েন যখন ৪১০ খ্রিস্টাব্দে নালন্দাতে আসেন, শিক্ষাকেন্দ্র রূপে নালন্দা তখনও বিখ্যাত হয়ে ওঠে নি।

নালন্দার নামকরণ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। তিনজন চৈনিক পরিব্রাজক নালন্দার নামের উৎস সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ফা-হিয়েন নালন্দাকে 'নাল' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইৎ সিং-এর মতে মহাবিহারের পার্শ্ববর্তী নাগানন্দ সরোবরের নাম থেকে নালন্দা নামের উৎপত্তি। অন্যদিকে হিউয়েন সাঙ নালন্দা নামের পিছনে বুদ্ধদেবের প্রভাবকে মেনে নিয়েছে। তাঁর মতে বুদ্ধদেব একসময় অবিশ্রান্ত দান করে ন-অলম্-দা বা নালন্দা উপাধি লাভ করেন এবং এই নাম থেকে মহাবিহারের নাম হয় নালন্দা।

চিত্র ৩.২ নালন্দার ধ্বংসাবশেষ

তথ্যসূত্রঃ *http://www.nrievents.com/Know-India-Facts-Info/Images/Nalanda-University.jpg*

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবিকাশ:

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর থেকে নালন্দা বৌদ্ধ তীর্থরূপে খ্যাতি লাভ করেছিল। ফা-হিয়নের ভারত ভ্রমণকালে নালন্দা সম্ভবত শুধুমাত্র তীর্থকেন্দ্ররূপে বিখ্যাত ছিল। ফা-হিয়েনের ভারত ত্যাগের (৪১০ খ্রি.) পর থেকে হিউয়েন সাঙের ভারতে পদার্পনের (৬২৯ খ্রি.) মধ্যবর্তী সময়কালে নালন্দা দ্রুত উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং মহাযান-বৌদ্ধধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করে।

নালন্দার এই উন্নতির পিছনে গুপ্ত সম্রাটদের অবদান বিরাট। সম্রাট কুমার গুপ্তের আমলে (৪১৫-৪৫৫ খ্রি.) সম্ভবত মহাবিহারের নির্মাণ কার্য শুরু হয়। তারপর তথাগত গুপ্ত, নরসিংহ গুপ্ত, বালাদিত্য ও বুধগুপ্ত নালন্দাতে বিহার নির্মাণ করেছিলেন। মহারাজ হর্ষবর্ধন ছিলেন সম্ভবত সর্বশেষ বিহারটির প্রতিষ্ঠাতা। বস্তুতঃ একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধদের যৌথ দানে ক্রমাগত মহাবিহারের সম্প্রসারণ ঘটে এবং বিশাল ব্যপ্তি লাভ করে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের বর্ণনা:

নালন্দার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বেশিরভাগ অংশই খনন করা যায় নি। তবে খনিত অঞ্চল ও তৎসন্নিহিত অংশ সমীক্ষা করে জানা গিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যপ্তি ছিল এক মাইল দীর্ঘ ও আধ মাইল প্রস্থ এলাকায় সাতটি বড় বড় হলঘর পরিলক্ষিত হয়েছে নালন্দার খনিত অংশে। এছাড়া অন্তত ৩০০টি ছোটো শ্রেণিকক্ষও ছিল যেখানে পড়ানো হত (Ghosh, A.,1965)। মহাবিদ্যালয়কে ঘিরে ছিল একটি প্রাচীর, যার দক্ষিণ দিকে ছিল প্রবেশদ্বার। নালন্দার সুউচ্চ মন্দির, মহাবিদ্যালয় বা বিহারগুলো সম্বন্ধে হিউয়েন সাঙ কাব্যিক বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষের সমস্ত বিহারগুলোর মধ্যে উচ্চতা ও

সৌন্দর্যে নালন্দাই সর্বশ্রেষ্ঠ। নালন্দার জল ও ফুলের যোগান দিত নীলপদ্ম ও স্বচ্ছ জলপূর্ণ সরোবর সমূহ। কানিংহাম সাহেবের মতে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্কর্যের নিদর্শন হল নালন্দা।

ছাত্রাবাস:

খননের ফলে অন্ততঃ ১৩টি ছাত্রাবাস পাওয়া গিয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীরা থাকতেন। মাটির নীচে এরকম আরও বহু ছাত্রাবাস থাকার সম্ভাবনাও আছে। এই ছাত্রাবাসগুলো সাধারণত দ্বিতল ছিল। প্রতিটি কক্ষে একজন বা দু'জন ছাত্র থাকতেন। কক্ষের মধ্যে কুলঙ্গি থাকত, যেখানে বই বা আলো রাখা যেত। বিহারগুলোতে জল সরবরাহের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল। এমনকি জল নিষ্কাষণের জন্য পয়ঃপ্রণালীও পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত পয়ঃপ্রণালী কোনোটা আবার আচ্ছাদন দিয়ে ঢাকা থাকত।

অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা:

নালন্দার সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল দিকের মধ্যে একটি হল অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা। এখানে ছাত্রদেরকে বিনামূল্যে চারটি অত্যাবশ্যক পরিষেবা বিনামূল্যে সরবরাহ করা হত। এগুলো হল – খাদ্য, বস্ত্র, শয্যা ও চিকিৎসা। বিভিন্ন রাজা ও ধনী সম্প্রদায়ের দানে এই ব্যয় নির্বাহ হত।

হিউয়েন সাঙের বর্ণনা অনুযায়ী, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ আসত প্রায় ১০০টি গ্রাম থেকে। পরে নালন্দার অধীনে আরও গ্রাম আসে। ইৎ সিঙের বর্ণনা অনুযায়ী, নালন্দার অধীনে ২০০টি গ্রাম ছিল। গ্রামবাসীরা নিয়মিত চাল, ডাল, দুধ ইত্যাদি সরবরাহ করত। হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায়, তার জন্য প্রত্যহ ৭

ছটাক মহাশালি চা, ২০টি জায়ফল, ১২০টি বাতাবি লেবু, আধ ছটাক কর্পূর ও প্রচুর দুধ ও মাখন বরাদ্দ ছিল

মহাবিহার পরিচালনা:

নালন্দা মহাবিহার গণতান্ত্রিক রীতি মেনে পরিচালিত হত। নালন্দার প্রধান কর্মসচিবকে বলা হত 'সর্বাধ্যক্ষ'। সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচনে প্রার্থীর জ্ঞানের পরিধি বিবেচিত হত। সর্বাধ্যক্ষকে সাহায্য করার জন্য থাকতেন দু'জন সহকারী কর্মাধ্যক্ষ – কর্মদান ও স্থবির। এঁদের একজন শিক্ষা বিষয়ক কর্মাদি যেমন, ভর্তি, পাঠক্রম নির্ধারণ, শিক্ষকদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতেন। অন্যজনের উপর দায়িত্ব ছিল, শৃঙ্খলা বজায় রাখা, খাদ্যগ্রহণ ও বণ্টন, পোশাক, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। নতুন গৃহাদি নির্মাণ ও মেরামতও ইনি করতেন (Beal. S.,1888) ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পদ্ধতি:

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাওয়া ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এটি ছিল উচ্চশিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হওয়া বা বাগ্মিতা ও বিতর্কে পারদর্শিতা লাভ করার উদ্দেশ্যে এখানে পরিণত বয়সের ছাত্ররা উপস্থিত হত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে একজন দ্বারপণ্ডিত নিযুক্ত থাকতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকগণের মধ্য হতে দ্বারপণ্ডিত নির্বাচিত করা হত। প্রবেশদ্বারে এই দ্বারপণ্ডিতদের কাছে ছাত্রদেরকে বিদ্যা ও মেধার পরীক্ষা দিতে হত। কথা ও গল্পচ্ছলে দ্বারপণ্ডিত দুরূহ প্রশ্ন উত্থাপন করতেন। একমাত্র সদুত্তর প্রদানকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেত। হিউয়েন সাঙের বর্ণনানুযায়ী দশজনের মধ্যে সাত-আটজনকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হত।

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতের সুদূরতম প্রান্ত থেকে এবং বিদেশ থেকেও ছাত্ররা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে এখানে আসতেন। চিন, জাপান, কোরিয়া, তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি দেশ থেকে ছাত্ররা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে এখানে আসতেন। অন্যান্য বিদেশী ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন তাওসিং, তাঙ্, তাঙলিপ, তাত্তাই, হিউলি, আর্যবর্ম প্রমুখ। হিউয়েন সাঙ্ বিশ্ববিদ্যলয়ের ১০০০০ ছাত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে ইৎ সিঙের মতে এখানে তিন হাজারের মতো ছাত্র ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ ছাত্রসংখ্যার এত পার্থক্যের কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওয়া যায় নি। ইৎ সিঙ সম্ভবত বিদেশি ছাত্রসংখ্যার কথা তাঁর বিবরণে উল্লেখ করে থাকবেন।

পাঠক্রম:

মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র হলেও নালন্দার পাঠক্রমে ভারতের সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত ছিল। পাঠ্যসূচি শুধু বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, হিন্দু দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাঠ্যসূচিতে স্থান পাওয়া বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল – ১) মহাযান ও অষ্টাদশ শাখার তত্ত্ব, ২) হীনযান ধর্মশাস্ত্র, ৩) তাত্ত্বিক বৌদ্ধশাস্ত্র, ৪) জাতকাদি, ৫) চতুর্বেদ, ৬) ন্যায়শাস্ত্র, ৭) ব্যকরণ ও ভাষাবিজ্ঞান, ৮) সাংখ্য বা যোগশাস্ত্র, ৯) জ্যোতিষ ইত্যাদি। এছাড়াও চিকিৎসাবিদ্যা, যাদুবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, ধাতুবিদ্যা এবং শিল্পস্থান বিদ্যারও পাঠ দেওয়া হত। হিউয়েন সাঙ্ নিজে শিলভদ্রের নিকট যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি হেতুবিদ্যা, ব্যকরণ, বেদ, জ্যোতিষ শাস্ত্র ও অধ্যয়ন করেছিলেন।

গ্রন্থাগার:

নালন্দার বিস্তৃত পাঠ্যসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এর সুবৃহৎ পাঠাগার। ছাত্রদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পাঠাগারে ছিল অসংখ্য পুঁথি। তিব্বতীয় সূত্র থেকে জানা যায়, গ্রন্থাগার অঞ্চলটি ধর্মগঞ্জ নামে অভিহিত হত। 'রত্নসাগর', 'রত্নরঞ্জক' ও 'রত্নদধি' নামের তিনটি সুদৃশ্য ও সুউচ্চ পাঠাগার ছিল, যার মধ্যে 'রত্নদধি' ছিল নয়তলা সৌধ।

অধ্যাপকমণ্ডলী:

নালন্দার খ্যাতির অন্যতম কারণ ছিল এর স্বনামধন্য অধ্যাপকবৃন্দ। হিউয়েন সাঙ্ নালন্দার বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপকগণের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর বর্ণনায়। এঁদের মধ্যে আছেন কাঞ্চিদেশের ধর্মপাল, সমতট নিবাসী শীলভদ্র, চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র, জ্ঞানচন্দ্র ইত্যাদি। ইৎ সিঙ-ও বিশ্ববিদালয়ের প্রথম দিকের বিখ্যাত অধ্যাপকদের নামও উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন নাগার্জুনদেব, অশ্বঘোষ, বসুবন্ধু, দিঙনাথ, কমলশীল ইত্যাদি। এই সমস্ত অধ্যাপকবৃন্দ শুধু শিক্ষাদানের মধ্যে নিজেদেরকে আবদ্ধ করে রাখতেন না, তাঁরা নানান শাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থও রচনা করেছেন। অষ্টম শতাব্দী থেকে নালন্দার অধ্যাপকগণ ধর্মপ্রচার কার্যে বিদেশ গমনও করতেন।

শিক্ষা প্রণালী:

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত শ্রেণিগত পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করা হত। প্রতিদিন প্রায় একশত বিষয়ে একশত বক্তৃতা হত। নিদ্রার সময় ব্যতিত সর্বদা অধ্যাপনার কাজ চলত। ইৎ সিঙ্ নালন্দার শিক্ষাপ্রণালীর একটা চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন। শ্রমণেরা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতেন এবং উপাধ্যায়ের সেবার পর ধর্মশাস্ত্রের একটি অংশ

পড়ত এবং পঠিত বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করত। আবৃত্তি ও উপলব্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। বক্তৃতা দেওয়া বা প্রবন্ধ রচনার অব্যাসও শিক্ষার্থীদেরকে করতে হত। আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অধীত বিদ্যাকে উপলব্ধি করতে পারত। হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানতে পারি, ছাত্রদের প্রশ্নোত্তর ও শিক্ষক-ছাত্রদের আলোচনার জন্য এমনকি সমস্ত দিনও যথেষ্ট ছিল না। এছাড়া অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীদেরকে হস্তলিখিত পুঁথির অনুলিপির কাজও করতে হত। নালন্দার ১০০০০ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রায় ১৫০০ জন শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। নালন্দাতে বিশ্বাস, ধর্মমত ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে আলোচনা করার সুযোগ ছিল।

নালন্দার অনুশাসন ও শিক্ষাপ্রণালীর গুণে শিক্ষার্থীদের ধর্ম ও নৈতিক জীবন অতি উচ্চাঙ্গের ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত নৈতিক অনুশাসন তারা কঠোরভাবে মেনে চলত। হিউয়েন সাঙ্-এর বর্ণনানুযায়ী ভিক্ষু বিদ্যার্থীদের জীবন ছিল পবিত্র এবং নিষ্কলঙ্ক। বিদ্যার্থীদের উপরই ন্যস্ত ছিল নৈতিক অনুশাসন বজায় রাখার দায়িত্ব। সভা ডেকে তারা নিজেরাই দোষ-ত্রুটি আলোচনা করত এবং প্রয়োজন হলে বয়কটের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হত। গণতান্ত্রিক রীতি মেনে এমনকি ঘর বন্টন করার ভারও বিদ্যার্থীদের উপর ন্যস্ত ছিল। নালন্দার নিয়মানুবর্তিতার সবচেয়ে বড় প্রসংশাটি এসেছে হিউয়েন সাঙ-এর কাছ থেকে। তাঁর কথায়, সাতশ বছরের মধ্যে একজন বিদ্যার্থীও নৈতিক অনুশাসনের বিরোধিতা করেননি। বিভিন্ন মতাবলম্বী ভিক্ষু, ব্রাহ্মণ, অ-ভিক্ষু, জৈন ইত্যাদির সমাবেশ সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও দিন শৃঙ্খলার অভাব পরিলক্ষিত হয় নি। এমনকি দৈনন্দিন জীবনে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে চলত। ঘণ্টা বা দামামা বাজিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে স্নান, খাওয়া, অধ্যয়ন, বিশ্রাম করার নির্দেশ জারি হত।

পরীক্ষা পদ্ধতি:

নালন্দাতে পরীক্ষা ও উপাধি দেওয়ার রীতির প্রচলন ছিল। শিক্ষাশেষে শিক্ষার্থীরা নিজেদের কৃতিত্বের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য রাজসভায় উপস্থিত হত এবং অন্যদের সঙ্গে বিতর্কে অংশগ্রহণ করত। রাজসভা থেকে কৃতি ছাত্ররা ভূমি ও উপাধি লাভ করত। শিক্ষা শেষে নিজের পছন্দ মতো জীবিকা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাও ছিল শিক্ষার্থীদের।

অবক্ষয় ও ধ্বংস:

বিক্রমশীলা মহাবিহারের উত্থানের পর নালন্দার খ্যাতি ম্লান হয়ে আসে। বিক্রমশীলার অভ্যুত্থানের পরবৌদ্ধ ধর্মে তান্ত্রিক মত প্রাধান্য পেতে শুরু করে। এর ফলে শিক্ষার অগ্রগতি হ্রাস পায়। অন্যদিকে নালন্দা অপেক্ষা বিক্রমশীলা নিয়ে পাল রাজারা বেশি আগ্রহ দেখাতেন। এসব কারণেই নালন্দার গৌরব হ্রাস পেতে থাকে। দ্বাদশ শতাব্দীতে মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি বক্তিয়ার খিলজীর হাতে নালন্দা বিশ্ববিদালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

৩.৪ বিক্রমশীলা

ভারতীয় বৌদ্ধশিক্ষাকেন্দ্রগুলির মধ্যে নালন্দার পরেই বিক্রমশীলার স্থান। শিক্ষাজগতে নালন্দার গৌরব যখন প্রায় স্তিমিত, তখন শিক্ষাক্ষেত্রে বিক্রমশীলার উত্তরণ।

উৎসসূত্র:

প্রধানত তিব্বতীয় সাহিত্যে বিক্রমশীলা মহাবিহারের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক তারানাথের বিবরণী, সুম্পা রচিত *পাগ্‌সাম জোন জান*, তিব্বতীয় তালিকা গ্রন্থ *ত্যাঙ্গুর* থেকে বিক্রমশীলার কথা জানতে পারা যায়।

ভৌগোলিক অবস্থান:

বিক্রমশীলার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত না হওয়ায় আজও এর ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। তারানাথের বিবরণ অনুযায়ী গঙ্গা তীরবর্তী কোনো পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল। এজন্য অনেকে মনে করেন, ভাগলপুরের কাছাকাছি রাজমহল গিরিশৃঙ্গের মধ্যে কোথাও এটির অবস্থান ছিল। নালন্দার সঙ্গে বিক্রমশীলার সম্পর্কের কথা মনে রেখে অনেকেই বলেন, বিক্রমশীলা নালন্দার কাছাকাছি কোন স্থানে অবস্থিত ছিল। গবেষক নন্দলাল দে-র মতে ভাগলপুর থেকে ২৪ মাইল পূর্বে পাথরঘাটা পাহাড়ে বিক্রমশীলা অবস্থিত ছিল। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মনে করেন, বিক্রমশীলা ভাগলপুরের সুলতানগঞ্জে অবস্থিত ছিল।

চিত্র ৩.৩ বিক্রমশীলা মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ

তথ্যসূত্রঃ *http://www.biharheritagewalk.com/sites/default/files/field/image/ruins%20of%20vikramshila.JPG*

নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা:

কথিত আছে বিক্রম নামে এক যক্ষের নামানুসারে মহাবিহারের নামকরণ করা হয়েছিল। অন্য মতে এখানকার ভিক্ষুরা শীল বা সদাচারে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলে মহাবিহারের নাম বিক্রমশীলা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাতা রাজা ধর্মপালের বিরুদ্ বা স্তুতি নামক বিক্রমশিলা অনুযায়ী এই বিহারের নামকরণ হয়ে থাকতে পারে।

অষ্টম শতাব্দীতে গোপালের পুত্র গৌড়ের রাজা ধর্মপাল (৭৭৫-৮০০ খ্রিস্টাব্দ) বিক্রমশীলা মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের চারটি শাখা অনুযায়ী চারটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে আচার, ব্যাকরণ, গুহ্যতত্ত্বের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করেন। প্রত্যেক শাখার মঠে সেই শাখার ২৭জন বিশেষজ্ঞ উপাধ্যায় হিসাবে মোট ১০৮টি মন্দির, ভিক্ষু ও শ্রমণদের বিহার, বক্তৃতার জন্য বড় বড় হলঘর নির্মাণ করা হয়েছিল। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হলে এর অধীনে ছয়টি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। আবার ছয়টি মহাবিদ্যালয়ের জন্য ছয়টি প্রবেশদ্বার ছিল। দ্বারগুলো সন্ধের পর বন্ধ হয়ে যেত, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার পরিচায়ক। যেসব ছাত্ররা সন্ধ্যার পর এসে পৌঁছতেন, তাঁদের আহার ও রাত্রিবাসের জন্য সদর দরজার পাশে ধর্মশালা থাকতেন।

পাল রাজারা বিক্রমশীলাকে দুর্গের মত করে গড়ে তুলেছিলেন। বিক্রমশীলা ছিল প্রাচীর বেষ্টিত। প্রধান ফটকে দুই পাশে নাগার্জুন ও অতীশ দীপঙ্করের চিত্র অঙ্কিত ছিল। মূলতঃ পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যায় নির্বাহ হত। তবে অনেক বিত্তবানও আর্থিক সাহায্য করতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়টি আবাসিক ছিল। প্রতিটি মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকত ছাত্রাবাস, সম্মেলন কক্ষ, গবেষণাগার, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। বিদেশ থেকে বহু ছাত্র এখানে

পড়তে আসতেন। তিব্বত থেকে প্রচুর ছাত্র আসতেন বলে তীব্বতীয়দের জন্য আলাদা ছাত্রাবাসও ছিল।

পরিচালনা:

বিক্রমশীলার কার্য পরিচালনার দায়িত্ব ছিল সর্বাধ্যক্ষের উপর। সর্বাধ্যক্ষকে সাহায্য করার জন্য ছয় সদস্যের একটি কর্মপরিষদ বা সংসদ ছিল। তবে সর্বাধক্ষার অনুমোদন ছাড়া কর্মপরিষদ বা সংসদের কোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হত না। বিক্রমশীলার পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা একটা সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ও পরিচালিত হত। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অধ্যাপক বিনিময় হত। অনেকের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের দায়িত্বও পালন করেছিলেন অতীশ দীপঙ্কর (রায় নীহাররঞ্জন,১৩৫৬)।

প্রবেশলাভ:

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ অত্যন্ত কঠিন ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি প্রবেশদ্বারে ছয়জন দ্বার-পণ্ডিত প্রবেশার্থীদের পরীক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রহণ করতেন। তবে যে সমস্ত ছাত্র কোনো বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন, তাদের কেবল দ্বার-পণ্ডিতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রবেশ করতে হত। তিব্বতীয় পণ্ডিত তারানাথের মতে পালবংশীয় একাদশ নৃপতি চনকের (৯৫৫-৯৮৫ খ্রি.) রাজত্বকালে দ্বার-পণ্ডিত পদের সৃষ্টি হয়। সম্রাট মহীপালের (৯৭৮-১০৩০ খ্রি.) সময়কালে ছয়জন বিখ্যাত দ্বার-পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায় (Bose, phanindranath, 1923) –

১) আচার্য রত্নাকর শান্তি (পূর্ব দ্বার)

২) আচার্য বাগীশ্বর কীর্তি মতান্তরে ভগীশ্বর কীর্তি (পশ্চিম দ্বার)

৩) আচার্য নাড়পাদ (উত্তর দ্বার)

৪) আচার্য প্রজ্ঞাকর মিতি (দক্ষিণ দ্বার)

৫) আচার্য রত্নবজ্র (প্রথম কেন্দ্রীয় দ্বার)

৬) আচার্য জ্ঞানশ্রী মিত্র (দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় দ্বার)

রত্নাকর শান্তি – আচার্য রত্নাকর শান্তি শ্রীমহাপণ্ডিত উপাধিধারী ছিলেন। ইনি শান্তিপাদ নামেও পরিচিত ছিলেন। ওদন্তপুরী মহাবিহারে উপসম্পদা হন। তিনি বৌদ্ধ ন্যায় শাস্ত্র ও ধর্ম বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বৌদ্ধ তন্ত্র সম্পর্কিত পুস্তকও তিনি রচনা করেছেন। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচারে তিনি সিংহলও গিয়েছিলেন।

বাগীশ্বর কীর্তি – বারাণসীর অধিবাসী আচার্য বাগীশ্বর কীর্তি রাজা চনকের আমলে দ্বার-পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইনি আচার্য ও মহাপণ্ডিত উপাধিধারী ছিলেন। ইনি তারা মায়ের উপাসকও ছিলেন।

নাড়পাদ – আচার্য নাড়পাদ মহাচার্য, পণ্ডিত প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত নৈয়ায়িক জেতারির ছাত্র ছিলেন তিনি। ভিক্ষু ধর্ম গ্রহণ করেও তিনি গৃহে বসবাস করতেন বলে তাঁর অন্য উপাধ ছিল – আর্য। তাঁর স্ত্রী নিগুও নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্না ছিলেন। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই হেবজ্রের উপাসক ছিলেন ও হেবজ্র সাধন পদ্ধতি নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। নাড়পাদ মগধের ফুল্লহরিতে তন্ত্রসাধনা করতেন। তিনি বহু তন্ত্রগ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তেঙ্গুরের তালিকায় তাঁর *বজ্রগতি, নাড়পণ্ডিতগীতিকা, একবীরহেরুক সাধন, গুহ্য সমাজ-উপদেশপঞ্চকমী, বজ্রযোগিনীগুহ্যসাধন* ইত্যাদি বইয়ের নাম রয়েছে। আচার্য অতীশ শ্রীজ্ঞান নাড়পাদের

কাছে যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। দীপঙ্কজ যখন ১৩০৮ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতে যান তখন তিনি গুরু নাড়পাদের দেহাবশেষ তিব্বতে নিয়ে গিয়েছিলেন এবগ তিব্বতরের নেথানের অর (Hor) নামক স্তূপে তাঁর দেহাবশেষ সমাধিস্থ করেন। তিব্বতের বিখ্যাত সিদ্ধাচার্য, মার-পাও নাড়পাদের ছাত্র ছিলেন।

প্রজ্ঞাকর মিতি – আচার্য প্রজ্ঞাকর মিতি রাজা চণকের রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভিক্ষু শ্রেণিভুক্ত ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মহাপণ্ডিত উপাধিও পেয়েছিলেন। *অভিসময়ালঙ্কার বৃত্তিপঞ্জার্থ* ও *বোধিচর্যাবতার পঞ্জিকা* নামক দুটি গ্রন্থও রচনা করেন।

রত্নবজ্র – আচার্য রত্নবজ্র কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বিক্রমশীলাতে অধ্যয়ন করে পণ্ডিত উপাধি লাভ করেছিলেন ও দ্বার-পণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ আছে।

জ্ঞানশ্রী মিত্র – আচার্য জ্ঞানশ্রী মিত্র বা জ্ঞানশ্রী ভদ্র গৌড়ের অধিবাসী ছিলেন। তিনি তিব্বতীয় ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলো হল – *প্রমাণবিনিশ্চয় টীকা, কার্য-করণ-ভার-সিদ্ধি, তর্কভাষ* ও *ব্রতমালা স্তুতি*।

পাঠক্রম:

বিক্রমশীলার পাঠ্যসূচি নালন্দার মত ব্যাপক ছিল না। তবে হীনযান ও মহাযান ধর্মশাস্ত্রাদি পঠনপাঠনের ব্যবস্থা ছিল। অন্যান্য বিষ্যের মধ্যে শব্দ বিদ্যা (ব্যাকরণ), হেতুবিদ্যা (ন্যায় শাস্ত্র), যাদুবিদ্যা, যোগশাস্ত্র, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাঠসূচিতে স্থাপত্যশিল্প, হস্তশিল্প, অঙ্কনবিদ্যাও স্থান পেয়েছিল। ভিক্ষুরা পুঁথি নকল করতেন, তান্ত্রিক দেবদেবীদের ছবি

আঁকতেন। শ্রমণরা মূর্তি নির্মাণও করতেন। ধাতু গলাবার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেওয়া হত। বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্র বিক্রমশীলার পাঠ্যক্রমের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছিল।

অধ্যাপকগণ:

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছয়টি মহাবিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ১০৮জন করে অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই বিহারের অধ্যক্ষকে বজ্রাচার্য বলা হত। তারানাথের বিবরণ অনুযায়ী প্রথম বজ্রাচার্য ছিলেন আচার্য বুদ্ধজ্ঞানপাদ। তিনি নিজেই একটি বৌদ্ধধর্ম শাখার শ্রষ্টা ছিলেন। এই বিষয়ে তিনি বইও লিখেছিলেন। বুদ্ধজ্ঞানপাদের পর ক্রমান্বয়ে দীপঙ্কর ভদ্র, লঙ্কা-জয় ভদ্র, শ্রীধর, ভবভদ্র, ভব্যকীর্তি, লীলাবজ্র, দুর্জয়চন্দ্র, কৃষ্ণসময় বজ্র, তথাগত রক্ষিত, বোধিভদ্র, কমল রক্ষিত বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন।

একজন আচার্যের পরিচয় পাওয়া যায় যিনি বরেন্দ্রভূমির জেতারি রাজা ধর্মপালের আমলে বিক্রমশীলার অন্যতম আচার্য ছিলেন। তাঁর ছাত্র ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর।

অতীশ দীপঙ্করের জন্ম ঢাকার বিক্রমপুরে, ৯৮২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন জাহোর বা সাহোরের রাজা কল্যাণশ্রী ও রানী প্রভাবতীর মেজো ছেলে। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। কৃষ্ণগিরি বিহারে রাগুল গুপ্তের কাছে তিনি তান্ত্রিকতত্ত্ব সম্বন্ধে জঙানলাভ করেন এবং ‘গুহ্যজ্ঞানবজ্র’ নামে অভিহিত হন। এছাড়া হীনযান, মহাযান ধারা, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগদর্শনের পূর্ণ জ্ঞানও আয়ত্ত করেন। ওদন্তপুরী বিহারের মহাসাঙ্ঘিক আচার্য তাঁর নাম দেন দীপঙ্করশ্রীজ্ঞান। তিনি বারো বছর বিক্রমশীলা মহাবিহারের দ্বার-পণ্ডিত নারোপা ও দুই বছর বজ্রাসনে মহাবিনয়ধর শীলরক্ষিতের

অধীনে অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি সুমাত্রা গিয়ে তৎকালীন বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ধর্মকীর্তির কাছে শিক্ষালাভ করেন। চুয়াল্লিশ বছর বয়সে দেশে ফিরে আসেন এবং অল্পদিনের মধ্যে মহীপালের আহ্বানে ১০২৫/১০২৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বিক্রমশীলা মহাবিহারে মহাচার্য পদে যোগদান করেন। পরে মহারাজ জয়পালের সময়ে তিনি সর্বাধ্যক্ষ হন। তিব্বতরাজ চানচুর তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে নাগোছা নামক এক ভিক্ষুকে পাঠিয়েছিলেন। নাগোছা এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন যার পৌরোহিত্য করেছিলেন স্থবিরশ্রেষ্ঠ বিদ্যা কোকিল। অনুষ্ঠানে ছাত্র, শিক্ষক, অতিথি – সব মিলিয়ে প্রায় আট হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। নাগোছা প্রত্যক্ষ করেছিলেন মগধের রাজা অপেক্ষা অতীশ, বীরবজ্র প্রভৃতির পণ্ডিতগণ অধিক সম্মানলাভ করতেন।

তিব্বতীয় দূত বিনয় ধর বিক্রমশীলার পণ্ডিত ভূমিগর্ভ ও বীর্যচন্দ্রের সাথে অতীশ ১০৪১ খ্রিস্টাব্দের শেষে বা ১০৪২ খ্রিস্টাব্দের প্রথমদিকে তিব্বত যাত্রা করেছিলেন। তিব্বতে তিনি 'বুদ্ধশিক্ষা' বা 'বকহ্ গদ্‌মস পা' (Bkahgdams-Pa) নামে এক নতুন সম্প্রদায় গঠন করেন এবং তাঁদের ধর্মগ্রন্থ *বোধিপথ-প্রদীপ* রচনা করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি তিব্বতে ধর্মপ্রচারে রত ছিলেন। তিব্বতীয় বিবরণ থেকে জানা যায়, মূল ও অনুবাদ রচনা নিয়ে তিনি প্রায় দুইশত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে নবম চান্দ্র মাসের ১৮ তারিখে লাসার কাছে স্‌ঞে-থঙ্ (Sne-Than)-এ তাঁর মৃত্যু হয়।

অতীশের পরবর্তীকালে বিখ্যাত অধ্যাপকদের মধ্যে রত্নকীর্তি, অভয়ংকর গুপ্ত, শাক্যশ্রী ভদ্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

বিক্রমশীলার শিক্ষণ ও পরীক্ষা পদ্ধতি:

বিক্রমশীলাতে শ্রেণিগত ও ব্যক্তিগত উভয় পদ্ধতি অনুসৃত হত। শ্রেণিশিক্ষায় বক্তৃতার রীতি প্রচলিত ছিল। আলোচনা ও বিতর্কসভায় ছত্রা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারতেন। বিক্রমশীলায় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের চর্চা ব্যাপকভাবে হওয়ায় গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক আরও নিকটতর হয়। তান্ত্রিক সাধনার অঙ্গস্বরূপ নানারূপ আচার-অনুষ্ঠান, প্রক্রিয়া আ গুহ্যতত্ত্ব শেখার জন্য গুরুর কাছে শিষ্যদের সবসময় থাকতে হত। তাই শ্রেণীশিক্ষার পাশাপাশি ব্যক্তিগত শিক্ষাও এখানে অপরিহার্য ছিল।

বিক্রমশীলাতে মৌখিক পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসৃত হত। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে যোগ্য শিক্ষার্থীরা উপাধিলাভ করতেন। পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত, উপাধ্যায় প্রভৃতি দেওয়ার রীতি ছিল। জেতারি মহীপালের কাছ থেকে 'পণ্ডিত' উপাধি লাভ করেছিলেন। কাশ্মীর নিবাসী রত্নবজ্রও 'পণ্ডিত' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। অধ্যাপক রত্নকীর্তি ও উড়িষ্যার তথাগত রক্ষিত যথাক্রমে 'মহাপণ্ডিত' ও 'উপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেছিলেন। নাগোছা বর্ণিত 'বিদাকোকিল' সম্ভবত পাণ্ডিত্য পরিচায়ক কোন উপাধি ছিল। Altekar-এর ভাষায়, "…diplomas and titles being given to the Vikramsila students at the end of their course by the reigning kings of Bengal."

মহাবিহারের অবক্ষয় ও ধ্বংস:

শ্রীজ্ঞান অতীশের ভারতে থাকাকালীন সময়েই বিক্রমশীলা শৃঙ্খলতাহীনতার সম্মুখীন হয়েছিল। এমনকি অতীশ দিবাকরচন্দ্র নামে কিংশুক সম্প্রদায়ের এক বৌদ্ধকে বহিষ্কারও করেছিলেন। অতীশের ভারত ত্যাগের পর বিক্রমশীলার হাল ধরার মত ব্যক্তিত্বশালী কোন নেতার আবির্ভাব হয়নি। সে সময় মহাবিহারের শান্তি-শৃঙ্খলার

অবনতি ঘটে ও মহাবিহারে অন্ধকার নেমে আসে। ১২০৩ খ্রি. বখ্‌তিয়ার খল্‌জি বিক্রমশীলা মহাবিহার ধ্বংস করে দেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে বখ্‌তিয়ারের নাকি দুর্গের মত মনে হয়েছিল। ঐতিহাসিক মিনহাজের লেখায় – "…The greater number of the inhabitants of the place were Brahmanas (i.e. Buddhist Bhikshus) and the whole of these Brahmanas had their heads shaven, and they were all slain. There were a great number of books on the religion of the Hindus there, and when all these books came under the observation of the Mussalmans, they summoned a number of Hindus that they might give them information respecting the importance of these books, but the whole of the Hindus had been killed. On becoming acquainted (with the contents of these books) it was found that the whole fortress and the city was a college."

৩.৫ বলভী বিশ্ববিদ্যালয়

উদ্ভব:

মৈত্রক রাজাদের শাসনকালে (৮৭৫- ???) খ্রিস্টাব্দ কাথিওয়াড় অঞ্চলে নালন্দার অনুকরণে এক শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল, যা পরবর্তীকালে বৌদ্ধশিক্ষার কেন্দ্ররূপে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। বলভীর রাজা দ্বিতীয় ধ্রুব সেনের পৃষ্ঠপোষকতায় এটি উচ্চশিক্ষার কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও কালক্রমে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিগণিত হয়।

হিউয়েন সাঙ্ ও ই-ত সিঙ দুজনেই বলভী পরিদর্শন করেছিলেন। বলভীতে অবস্থানকালে সেকানকার শিক্ষা পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করার সুযোগ তাঁদের ছিল। তবে

হীনযান মতবাদের কেন্দ্র হওয়াতে দুজনেই বলভীর প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করেননি। *কথাসরিৎসাগর* গ্রন্থেও বলভীর কথা উল্লেখিত হয়েছে।

শিক্ষাকেন্দ্রের বর্ণনা:

অনেকের মতে নালন্দাকে অনুকরণ করে বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে উঠলেও এটি নালন্দার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবেই সুনাম অর্জন করেছিল। হিউয়েন সাঙের লেখা থেকে জানা যায় যে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রায় এক শত বৌদ্ধবিহার এখানে অবস্থিত ছিল যেখানে প্রায় দুইহাজার ভিক্ষু ছাত্র অধ্যয়ন করতেন (বড়ুয়া,শ্রীধর চন্দ্র, ১৩৪১, কলকাতা)।বৌদ্ধ পণ্ডিত স্থিরমতি ও গুণমতি এখানেই শিক্ষালাভ শেষে অধ্যাপনার কাজ করতেন। পরে তাঁরা দুজনে নালন্দার অধ্যাপক পদে নিয়োজিত হয়েছিলেন। ই-ত সিঙের বর্ণনা অনুসারে ছাত্ররা এখানে দুই বা ততোধিক বছর থেকে শিক্ষালাভ করতেন। এমনকি গাঙ্গেয় উপত্যাকা থেকে এখানে ব্রাহ্মণ সন্তানরা শিক্ষাগ্রহণ করতে আসতেন।

চিত্র ৩.৪ বলভী -র ধ্বংসাবশেষ

তথ্যসূত্রঃ *https://ankurlearningsolutions.files.wordpress.com/2014/12/vallabhi-univeristy.jpg*

রাজন্যদের বদান্যতায় এখানকার ব্যয়ভার নির্বাহিত হত। রাজাদের অনুগ্রহে এখানকার পাঠাগার সমৃদ্ধ হত।

পাঠক্রম:

এখানে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও ব্রাহ্মণ্যগ্রন্থাদির চর্চা হত। ধর্মবিষয়ক জ্ঞানচর্চা ছাড়াও নীতিশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, গোপালন, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ই-ত সিঙের বিবরণ থেকে জানা যায় বলভীর ছাত্ররা শাসন বিভাগের উঁচু পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং বলভীতে সম্ভবত শাসনকার্য সম্পর্কেও শিক্ষাদান করা হত।

৩.৬ সারনাথ

সম্রাট অশোকের সময়ে সারনাথের সঙ্ঘারামটি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিনত হয়। শিক্ষা বিস্তারের প্রতি সম্রাট অশোকের সমান আগ্রহ ছিল। সারনাথের শিক্ষাকেন্দ্রটি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। খ্রিস্টিয় অষ্টম শতাব্দীতে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্ররূপে সারনাথের বিশেষ খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল(W P Gurge, 1971)। হীনযানপন্থীদের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল বলে হিউয়েন সাঙ সারনাথের সম্পর্কে কোনো মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেননি। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, এখানে প্রায় দেড় হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করতেন এবং দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর খ্যাতি অব্যাহত ছিল।

চিত্র ৩.৫ সারনাথের ধ্বংসাবশেষ

তথ্যসুত্রঃ গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ

৩.৭ ওদন্তপুরি

পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল অষ্টম শতাব্দীতে নালন্দার ষাট মাইল উত্তরে ওদন্তপুরী বা উদন্তপুরমে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার বিখ্যাত উপাধ্যায়দের মধ্যে বাঙালি অধ্যাপক প্রভাকর সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন (রায় নীহাররঞ্জন,১৩৫৬)। তাঁর সময়ে প্রায় এক হাজার বৌদ্ধ শিক্ষার্থী এখানে শিক্ষালাভ করতেন। এখানে একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল যেখানে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের প্রচুর বই ছিল। নালন্দা ও বিক্রমশীলার সঙ্গে এই বৌদ্ধ মহাবিহারটিকেও বখ্তিয়ার খিলজি ধ্বংস করেন।

চিত্র ৩.৬ ওদন্তপুরীর ধ্বংসাবশেষ

তথ্যসূত্রঃ *http://www.letsseeindia.com/upload/place/1.%20Odantapuri-W.jpg*

৩.৮ জগদ্দল মহাবিহার

জগদ্দল মহাবিহার বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের গৌরবময় রাজত্বকালে তাদের সাম্রাজ্যের নানা স্থানে প্রভূত সংখ্যায় বৌদ্ধ মঠ, মন্দির ও স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। ধর্মপাল কমপক্ষে ৫০টি স্বয়ংসম্পূর্ণ বৃহদায়তন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন বলে মনে করা হয়। পাল রাজাদের নির্মিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মগধের বিশালায়তন বিক্রমশীলা মহাবিহার, বিক্রমপুরের বিক্রমপুরী বিহার এবং বরেন্দ্র অঞ্চলের সোমপুর মহাবিহার ও জগদ্দল মহাবিহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অবস্থান:

জগদ্দল প্রত্নস্থলটি অনুসন্ধান করতে গিয়ে গবেষক জাকারিয়া একই নামের পাঁচটি প্রাচীন স্থানকে চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট করেন, যার মধ্যে চারটি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত, আর একটির অবস্থান পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায়। এগুলি হল – ক)

পঞ্চগড়ের জগদ্দল, খ) ঠাকুরগাঁঅ জেলার হরিপুর উপজেলার জগদ্দল, গ) দিনাজপুর জেলার বামনগোলা থানার জগদল, ঘ) নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার জগদল এবং ঙ) পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার বামনগোলা থানার জগদল। ব্যক্তিগতভাবে এইসব স্থান ভ্রমণ করে সতর্ক পর্যালোচনার মাধ্যমে জাকারিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কেবল নওগাঁ জেলার জগদল ছাড়া অন্য চারটি স্থানে বিবেচনায় আনার মতো প্রাচীন যুগের তেমন কোনও চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। তাই তিনি ধামইরহাটের জগদলের বিস্তৃত ঢিবিকেই বিখ্যাত জগদ্দল মহাবিহারের সম্ভাব্য স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেন।

জগদ্দল গ্রামের এক বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঢিবি ও পরিত্যক্ত পুকুর। জয়পুরহাট-ধামইরহাট মহাসড়কের হাতিটাকিডাঙা বাজারের তিন কিলোমিটারের উত্তর-পূর্বে, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের প্রায় ১.৫ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং ধামইরহাট উপজেলা কার্যালয়ের ৮ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে এর অবস্থান। এই স্থান থেকে পাহাড়পুর ও হলুদ বিহার বৌদ্ধ মন্দিরের দূরত্ব যথাক্রমে মাত্র ২০ ও ১৮ কিলোমিটার।

নির্মাণের ইতিহাস ও পরিচয়:

জগদ্দল মহাবিহার নির্মাণ করেন রাজা রামপাল (১০৭৭-১১২০)। মদনপালের রাজত্বকালে রচিত সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতম গ্রন্থ অনুসারে এই বিহারের অবস্থান বরেন্দ্র-ভূমিতে। নানা পণ্ডিত এই বিহারের নির্মাণ ও সমৃদ্ধিতে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন।

চিত্র ৩.৭ জগদ্দল মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ

তথ্যসুত্রঃ

http://3.bp.blogspot.com/-NRS6FasLcFk/UTHMI3UgitI/AAAAAAAABDM/IHIW7gm6eDs/s1600/Photo0372.jpg

প্রখ্যাত অধ্যাপক:

বিভূতি চন্দ্র, দানশীল, মোক্ষকর গুপ্ত ও শুভকর গুপ্তের ন্যায় তিব্বতের কয়েক জন বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিতের নাম এক্ষেত্রে পাওয়া যায়। শুভকর গুপ্ত ও অভয়কর গুপ্ত বিক্রমশীলা মহাবিহারের অন্যান্য পণ্ডিতসহ ওই বিহারের ধ্বংসের পর জগদ্দল মহাবিহারে আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। এখানে তাঁরা বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করান। এইসব পণ্ডিতের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বাঙালি (Bose, 1923)। ধর্মীয় বিষয় নিয়ে লেখালখির পাশাপাশি এঁরা ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষ করে কবিতার বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতেন। 'সুভাষিত রত্নকোষ'-এর সংকলক বিদ্যাকর ছিলেন সুদূরখ্যাত জগদ্দল মহাবিহারের একজন পণ্ডিত। সম্ভবত

মহাযান ধর্মমতের বজ্রযান ও তন্ত্রযান দর্শন সংক্রান্ত বেশ কিছু সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ জগদ্দল বিহারেই তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এই 'সংঘরাম'-এর প্রধান বৌদ্ধ দেবতা ছিলেন অবলোকিতেশ্বর।

৩.৯ অধ্যায় পরিশেষ:

বুদ্ধদেব প্রবর্তিত সঙ্ঘ ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার আদি কেন্দ্র। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় ছিল সকল মানুষের অবাধ অধিকার। ছিল না জাতি-বর্ণের প্রতিবন্ধকতা। অর্থাৎ এই শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল গণতান্ত্রিক। খ্রীষ্টপূর্ব কাল থেকেই এই শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্ররূপে আমরা গড়ে উঠতে দেখি তক্ষশীলার মত বিশ্ববিদ্যালয়। অর্থাৎ এদেশে প্রথম সুসংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে বৌদ্ধদের হাত ধরেই। বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজন হয় বেতন ভিত্তিক শিক্ষককুলের।অশোক বা কণিষ্কের মত শক্তিশালী রাজারা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ায় অনেক সময় রাজ পৃষ্ঠপোষকতা হয়ে ওঠে বেতনের যোগানদার আবার অনেক সময় ছাত্রদের অনুদান থেকেও আসতে থাকে শিক্ষককুলের বেতন।শিক্ষকরা তৈরী করেন বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যসূচী।সেখানে বৌদ্ধ ধর্ম এবং দর্শনের সাথে স্থান পায় সাহিত্য, বিঞ্জান,অঙ্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়।শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সংস্কৃতের পরিবর্তে প্রচলিত হয় সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা পালি। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত মঠ, বিহার ও দেবালয়গুলি জন্ম দেয় তক্ষশীলার মত আরও অনেক বিদ্যাশিক্ষা কেন্দ্রের। ধীরে ধীরে বিকশিত হয় নালন্দা, বিক্রমশীলার মত বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলি।

গবেষণাসূত্র

Keay, F.E, (1992) Ancient Indian Education: An Inquiry into Its Origin, Development, and Ideals, New Delhi, Cosmo Publications

বাগচী প্রবোধ চন্দ্র,(১৩৫৯)-বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য,কলকাতা।

Dutt Nalinaksha, (1960) Early Monastic Buddhism, Vols.I and II, Calcutta

Singh, Bhanu Pratap, (1990), Aims of Education in India: Vedic, Buddhist, Medieval, Bristish and Post-Independence, Delhi,

Mukherjee Radha Kumud, (1947), Ancient Indian Education- Brahamanic and Buddhist, Delhi, Motilal Banarsidas

Altekar A. S., (1965), Education in Ancient India., Varanasi, Nandkishore & Brothers

Ghosh, A., (1965), Nalanda, New Delhi

Beal. S., (1888), The Life of Hiuen-Tsiang, London

রায় নীহাররঞ্জন, (১৩৫৬),বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব),কলকাতা

Bose, Phanindranath, (1923), Indian Teachers of Buddhist Universities, Madras

বড়ুয়া শ্রীধর চন্দ্র, প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যাপীঠ, (১৩৪১), কলকাতা।

W P Gurge, (1971), The Contribution of Buddhism. (A paper presented in International Seminar on Buddhism, Delhi)